স্মার্ট বাংলাদেশ হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী

হীরেন পণ্ডিত

উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এরই মধ্যে স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশও স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হওয়ার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আগামীতে যেসব দেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে এগিয়ে থাকবে, তারাই ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় নিজেদের নিয়ে যেতে পারবে। বাংলাদেশ দিন দিন স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত হচ্ছে, যা দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে আছি। যেখানে আমরা ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং রোবটিক্স নিয়ে ভাবছি। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী, উন্নত ও আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর শামিল। স্মার্ট রাষ্ট্র বলতে আমরা বুঝি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নির্মল ও স্বচ্ছ তথা নাগরিক হয়রানিবিহীন একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে কোনো বৈষম্য ও ভোগান্তি থাকবে না। বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে বিনির্মাণের জন্য সরকার চার ভাগে ভাগ করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চান। দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং অর্থনীতির সকল কার্যক্রম প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হবে। স্মার্ট গভর্নমেন্ট ইতোমধ্যে অনেকটা হয়ে গেছে। বাকিটা করে নিতে হবে। এভাবেই গোটা সমাজই একদিন স্মার্ট সোসাইটি হবে। এ বিবেচনায় ২০২১ থেকে ২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গেছে। এজন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা এ বঙ্গীয় বদ্বীপ যেন জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষা পায়, দেশ উন্নত হয়, দেশের মানুষ যাতে সুন্দর, সুস্থ ও স্মার্টলি বাঁচতে পারে, সেজন্য ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ হাতে নিয়েছেন।

২০০৮ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ ২০২১ সালের মধ্যেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ঘোষণা করে। ২০১৭ সালের ২৭ নভেম্বর সরকার ১২ ডিসেম্বরকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। গত ১৬ বছরে দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়েছে। অনেক সেবা অনলাইনে মিলছে। ভার্চুয়াল লেনদেন বাড়ছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে যাত্রার কথা ঘোষণা করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট দেশ হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়ে সরকার বলছে, দেশের তরুণ প্রজন্মই হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের প্রতিটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে দক্ষ জনশক্তি।

ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের তথ্যমতে, গত এক যুগে দেশের ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সরকারের দাবি, ইউনিয়ন পর্যায়ের ডিজিটাল সেন্টার ও ডিজিটাল ডাকঘরের মাধ্যমে ৬০০ ধরনের ডিজিটাল সেবা পাচ্ছে সাধারণ মানুষ। বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে মোবাইল সিম নিবন্ধন হচ্ছে। ই-পাসপোর্ট চালু হয়েছে। সরকারি ওয়েবপোর্টাল তথ্য বাতায়নে ৫২ হাজারের বেশি সরকারি অফিস যুক্ত আছে। ৪৬টি হাইটেক পার্ক ও ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ে উঠেছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, দেশে ৬ লাখ ৫০ হাজারফ্রিল্যান্সার রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে বছরে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৮ সালে যেখানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ লাখ, ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৬১ লাখে। মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, রাইড শেয়ারিং, ই-কমার্স খাত সম্প্রসারিত হয়েছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম হচ্ছে অনলাইনে। তাই স্মার্ট বাংলাদেশ হচ্ছে সরকারের প্রদত্ত একটি প্রতিশ্রুতি বা স্লোগান, যা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চারটি ভিত্তি হচ্ছে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ। স্মার্ট নাগরিক ও স্মার্ট সরকারের মাধ্যমে সব সেবা মাধ্যম ডিজিটালে রূপান্তরিত হবে। স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করলে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জননেত্রী শেখ হাসিনা চারটি মাইলস্টোন দিয়েছেন।

এগুলো হচ্ছে ২০২১ সালের রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ; যা অর্জন করে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সালের জন্য। স্মার্ট শহর বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট পরিবহন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন,

জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট সংযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এক শিক্ষার্থী, একটি ল্যাপটপ, এক স্বপ্নের উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় সব ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নাম পরিবর্তন করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠন করেছে বাংলাদেশ সরকার। এ টাস্কফোর্সের চেয়ারপারসন হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাকি ২৯ জন হচ্ছেন সদস্য। টাস্কফোর্সের কার্যাবলি হচ্ছে : অগ্রসরমান তথ্যপ্রযুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রমকে স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

স্মার্ট এবং সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিম-লে তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিধিবিধান প্রণয়নে দিকনির্দেশনা প্রদান প্রভৃতি। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। এক কথায় সব কাজই হবে স্মার্ট।

স্মার্ট বাংলাদেশ শুধু একটি স্লোগান নয়, আগামী দুই যুগ ধরে চলবে এমন এক বিশাল কর্মযজ্ঞের নাম স্মার্ট বাংলাদেশ। সরকারের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল গ্রহণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে অনেক বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তখন বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বর্তমানের চেয়ে ৫-১০ গুণ বাড়তে পারে। স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট জাতি গঠনই আমাদের লক্ষ্য। দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার প্রধান হাতিয়ার তথা মূল চাবিকাঠি হবে ডিজিটাল সংযোগ। স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ প্রতিষ্ঠা ও উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগুলো হলো– বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠায় স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ ভিশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠিত হবে।

এটি বাস্তবায়ন করবে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলা এবং পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে ডিজিটাল ইনক্লুশন ফর ভারনারেবল এক্সেপেশন (ডাইভ) উদ্যোগের আওতায় আত্মকর্মসংস্থানভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের। শিক্ষার্থীদের অনলাইন কার্যক্রম নিশ্চিতে 'ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম' এর আওতায় শিক্ষার্থীদের ল্যাপটপ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

যা বাস্তবায়ন করবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। স্মার্ট ও সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তুলতে ডিজিটাল লিডারশিপ অ্যাকাডেমি স্থাপন। বাস্তবায়ন করবে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। ক্ষুদ্র কুটির, ছোট, মাঝারি ব্যবসাগুলোর জিডিপিতে অবদান বাড়াতে এন্টারপ্রাইজভিত্তিক ব্যবসাগুলোকে বিনিয়োগ উপযোগী স্টার্টআপ হিসেবে প্রস্তুত করা।

এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে রয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। অল্টারনেটিভ স্কুল ফর স্টার্টআপ এডুকেশন অব টুমোরো (এসেট) প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এটি বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশ নলেজ ডেভেলপমেন্ট পার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা। এটি বাস্তবায়ন করবে হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। সেন্টার ফর লার্নিং ইনোভেশন অ্যান্ড ক্রিয়েশন অব নলেজ (ক্লিক) স্থাপন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এটি বাস্তবায়ন করবে। এজেন্সি ফর নলেজ অন অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরাইজন (আকাশ) প্রতিষ্ঠা।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ তা বাস্তবায়ন করবে। সেলফ অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেইনরশিপ ডেভেলপমেন্ট (সিড) প্ল্যাটফর্ম স্থাপন। এটি হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। কনটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লিংকেজ ল্যাব সেল স্থাপন। তথ্যপ্রযুক্তি অধিদপ্তর এটি বাস্তবায়ন করবে। সার্ভিস এগ্রিগেঁর ট্রেইনিং (স্যাট) মডেলে সরকারি সেবা ও অবকাঠামোনির্ভর উদ্যোক্তা তৈরি করা।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এটি বাস্তবায়ন করবে। সকল ডিজিটাল সেবাকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডে নিয়ে আসা। এটি বাস্তবায়নে থাকবে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। ডেটা নিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল সার্ভিস আইন, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (শিফট) আইন, এজেন্সি ফর নলেজ অন অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরাইজন (আকাশ) আইন, ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিওরশিপ অ্যাকাডেমি (আইডিয়া) আইন, ডিজিটাল লিডারশিপ অ্যাকাডেমি আইন ও জাতীয় স্টার্টআপ পলিসি প্রণয়ন। এ বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য বিশ্বের সকল উন্নত দেশ প্রস্তুত হচ্ছে। আসন্ন এই বিপ্লবের মাধ্যমে সকল দেশ নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইন্টারনেট অব থিংসের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। তাই এই শিল্প বিপ্লব থেকে লাভবান হওয়ার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্র।

ডিজিটাল দুনিয়ায় বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন এবং উৎপাদন ব্যবস্থা বদলে যাচ্ছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনবলকে এই পরিবর্তনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে দেশের সবটাই উন্নত বিশ্বের মতো প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলা, যাকে এক কথায় ডিজিটালাইজেশন বলা হয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিনির্ভর ডকুমেন্টের গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। দেড় যুগ আগে হাতে নেওয়া ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা এখন শতভাগ সফল।

ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা এ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত। উন্নত বিশ্বেও দেশগুলো এরই মধ্যে স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশও স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হওয়ার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আগামীতে যেসব দেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে এগিয়ে থাকবে, তারাই ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় নিজেদের নিয়ে যেতে পারবে।

বাংলাদেশ দিন দিন স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত হচ্ছে, যা দেশকে উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে আছি। যেখানে আমরা ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং রোবটিক্স নিয়ে ভাবছি। দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। অভূতপূর্ব উন্নতির কারণে বাংলাদেশ এক সময় গোটা বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর একটি হতে পারে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সকলের করণীয়: আওয়ামী লীগ সরকার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠনে সমর্থ হয়েছে। শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এ সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ ঘোষণা- বাংলাদেশকে তারা স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চান। স্মার্ট বাংলাদেশ হতে হলে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি এবং স্মার্ট সমাজ গড়তে হবে। এ কাজটি অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষভাবে স্মার্ট অর্থনীতি এবং স্মার্ট সমাজ নিশ্চিত করা। এর সঙ্গে আছে ভূ-রাজনীতির প্রতিযোগিতা ও অভ্যন্তরীণ টানাপড়েন। ভূ-রাজনীতির প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে ভারত ও চীন। বাংলাদেশের হৃদয়ে ভারত না চীন কে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট করতে সক্ষম হচ্ছে- তা-ই আগামী দিনে শেখ হাসিনার ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জের অন্য একটি বড় পক্ষ আমেরিকা। ভোটের আগে তার চ্যালেঞ্জ ছিল; কিন্তু ভোটের পরে এখন তার ওপর আরো বড় চ্যালেঞ্জ ভর করে থাকবে। এবারের নির্বাচনে ভারত যেমন আমেরিকার বিরোধিতা করেছে, তেমন করেছে চীন। ভারত এবং চীন দুটি রাষ্ট্রই চোখ বুজে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন স্থিতিশীল বাংলাদেশ দেখতে চেয়েছে। তাই নির্বাচন আবহে তারা প্রতিযোগিতা করে, যা দেখার প্রয়োজন, তাই দেখেছে; আর যা দেখার প্রয়োজন নেই, তা দুজনেই দেখেনি। হাসিনাকে নিজ বলয়ে শক্ত করে ধরে রাখতে দুজনেরই চেষ্টার অভাব ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটাও বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার কোনো বিকল্প নেই। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সম্পর্ক বিদ্যমান। নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি এখনো অস্বস্তিতে আছে। সেই অস্বস্তি এবার স্বস্তিতে পরিণত করা যাবে কি না, তা-ও বাংলাদেশের সরকারকে গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখতে হবে।

স্মার্ট অর্থনীতি এবং স্মার্ট সমাজ নিশ্চিত করা বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। বিশ্বব্যাংক ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে, বৈশ্বিক অর্থনীতির অগ্রগতি গড়ে ২ শতাংশের মধ্যে থাকবে। স্পষ্টত বোঝা যায়, অর্থনীতির বৈশ্বিক পরিবেশ এবার বাংলাদেশের অনুকূলে থাকবে না। অভ্যন্তরীণ সক্ষমতাও চ্যালেঞ্জের মুখে আছে। অন্যতম সমস্যা বৈদেশিক মুদ্রা। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় খাত রপ্তানি সেক্টর এখনো। এখানে প্রবৃদ্ধির হার ২ শতাংশেরও কম। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত জনশক্তি রপ্তানি। সেখানে প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশেরও কম। সুতরাং অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বাড়ার খুব একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না অদূর ভবিষ্যতে।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের সীমা ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেও নেমে গিয়ে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দিচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। এমন অর্থনীতিকে স্মার্ট হিসেবে টেনে নেওয়া অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বৈকি! কেননা মূল্যস্ফীতি আর আয়বৈষম্য বাংলাদেশের অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জের জায়গায় বরাবরই রয়ে গেছে। ঠিক এমন একটি ঝড়ের সামনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে নতুন মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীকে। তিনি সফল কূটনীতিক হলেও অর্থনীতির বেড়াজালে একেবারে নতুন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসে দুই অর্থমন্ত্রীকে একটানা বহু বছর অর্থ মন্ত্রণালয় সামলাতে দেখেছে মানুষ। বিএনপির সাইফুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের আবুল মাল আবদুল মুহিত টানা কয়েকবার একই দায়িত্বে থাকার কারণে অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই নতুন মন্ত্রীর মনের জোর কতটা হবে- আসন্ন ঝড় সামলিয়ে স্মার্ট অর্থনীতি উপহার দিতে তা-ই আমাদেও দেখার পালা। আয়বৈষম্য এবং ধর্মান্ধ সমাজ বহুদিন ধরেই চোখ রাঙাচ্ছিল বাংলাদেশকে। ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর খুব বড় ধরনের সমর্থন নেই আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি। সমাজজীবনে এই ধর্মান্ধ শ্রেণি ইতিমধ্যে তাদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে ভালোভাবেই। কিন্তু এখন স্মার্ট সমাজ গড়তে হলে সরকারকে শুধু সেদিকে নজরই নয়, বড় ধরনের চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হবে।

ভারত-চীন এই দুই পরাশক্তির নিজেদের মধ্যে রেষারেষি আছে সব সময়ের জন্য। বাংলাদেশ নিয়ে তাদের যেমন আলাদা করে সহযোগিতা

আছে, আবার রেষারেষির ঢেউও আছে। মালদ্বীপ নিয়ে নতুন অস্বস্তিতে আছে চীন ও ভারত। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশের জন্য একজনকে ছেড়ে দেওয়া মানেই হলো 'শ্যাম রাখি না কূল রাখির সমস্যা'। চীন-ভারতের পর আমেরিকা এবং পশ্চিমাদের সঙ্গে আছে সম্পর্কের জটিল বিষয়টিও। ভারত, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের ত্রিমুখী সম্পর্ককে আগামী দিনে হাসিনা সরকার কীভাবে ব্যালেন্স করবে- তার ওপর নির্ভর করবে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার চিত্র। অন্যদিকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিভাজিত আন্তর্জাতিক মহলকে মোকাবিলা করার চ্যালেঞ্জ রয়েছে নতুন সরকারের সামনে। কেননা এখনো বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া স্বস্তিতে নেই।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও শিক্ষকতা পেশায় নতুন চ্যালেঞ্জ: সপ্তদশ শতকে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, তা আজ বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের প্রধান নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, যার গতি কল্পনার গতিকেও হার মানায়, যা আমাদের বিদ্যমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা, শিক্ষা ও উৎপাদনব্যবস্থাপনায় টর্নেডোর মতো ঝড় তুলে নতুনত্বের ধারণা নিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। আমাদের চিন্তাজগতকে করেছে প্রসারিত ও পেশাগত জীবনকে করেছে চ্যালেঞ্জিং। আমাদের মনোজগতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। টিকে থাকার লড়াইয়ে তাই বারবার আমাদের সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কেননা আগামী ১০ বছরে বর্তমানের অনেক পেশা হারিয়ে যাবে এবং তদস্থলে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনশক্তির বিপুল চাহিদা তৈরি হবে। এভাবে আগামীর পৃথিবী কতটা পরিবর্তন হতে পারে, তা আমাদের ভাবনাতেও নেই। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে এমনটি হতে পারে। পরিবর্তিত এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আধুনিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি শিক্ষকদের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব মনোভাব কীভাবে যুগোপযোগী হবে, তাই নিয়ে এখন আলোচনা চলছে শিক্ষাবিদদের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে দক্ষ শিক্ষকই কেবল পারেন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে শিল্পবিপ্লবের সফলতা নিশ্চিত করতে। তাই আজকের যোগ্য শিক্ষকই আগামীর চ্যালেঞ্জিং জাতি বিনির্মাণের প্রধান কারিগর। শিক্ষকদের তাই প্রথমত যুগোপযোগী টিচিং লার্নিং মেথড সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ মেথড বাস্তবায়নে বর্তমানে একটি আদর্শ অ্যাপ্লিকেশন বা মডেল, যেখানে বিষয়বস্তু, শিক্ষাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একটি চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ-শিখন ফলপ্রসূ করাই এ মডেলের উদ্দেশ্য। এ মডেল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকের টেকনোলজিক্যাল, পেডাগোজিক্যাল ও কনটেন্ট নলেজের দক্ষতা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের সময়োপযোগী চাহিদা পূরণে বর্তমানে এ পদ্ধতি বিশ্বে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মালটিমিডিয়া ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের আনন্দের সঙ্গে ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাদানকে স্থায়ী ও ফলপ্রসূ করাই এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান কারিকুলামে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, ব্রেইন স্টর্মিং, সৃজনশীলতা, বিতর্ক প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো হয়। কী শিখতে হবে, তার পরিবর্তে কীভাবে শিখতে হবে, তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা অর্জনে সক্ষম ও আগ্রহী করা এবং আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাকে স্থায়ী ও ফলপ্রসূ করা এ পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য।

একবিংশ শতকের শিক্ষকের প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণে 'মুক্তপাঠ' একটি চমৎকার প্ল্যাটফরম, যেখানে একজন শিক্ষক অনলাইনে বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করে নিজের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজেকে শিক্ষার নতুন নতুন আইডিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারেন। অন্যদিকে 'শিক্ষক বাতায়ন' শিক্ষকদের একটি সর্ববৃহৎ প্ল্যাটফরম, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ মানসম্মত ডিজিটাল কনটেন্ট আপলোড, ডাউনলোড, ব্লগ বা কমেন্ট প্রভৃতি করতে পারেন। কনটেন্ট নির্মাণ করে এখানে সেরা কনটেন্ট নির্মাতা ও ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে একজন শিক্ষক এখানে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদাও লাভ করতে পারেন। তাই শিক্ষকদের এ দু'টি প্ল্যাটফরমে যুক্ত থাকা এখন সময়ের দাবি।

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে একটি নবতর সংযোজন হচ্ছে ব্লেন্ডেড লার্নিং, যা ট্র্যাডিশনাল মেথডের সঙ্গে ই-লার্নিংয়ের সমন্বয়ে একটি হাইব্রিড টিচিং মেথড। এখানে সশরীরে উপস্থিতি ও অনলাইন পদ্ধতির মিশ্রণে শিক্ষণ শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি একজন বিহেভিয়ার স্পেশালিস্ট হিসেবে আবির্ভূত হন। অনলাইন ও অফলাইন উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণ করা শিক্ষকের জন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে শিক্ষককের শিখন বিজ্ঞানে দক্ষতার পাশাপাশি গুগল ক্লাসরুম, গুগল ফরম, গুগল মিট, জুম, মাইক্রোসফট টিম, এডমোডো, এ আই টুলসে প্রভৃতি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারে পারদর্শী হতে হয়। এজন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এ যুগে শিক্ষকদের পাঁচটি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করার কথা বলা হয়েছে। আর তা হলো : শিক্ষণ বিজ্ঞানে যোগ্যতা, সামাজিক যোগ্যতা, ব্যক্তিগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা, প্রযুক্তিগত যোগ্যতা।

সম্প্রতি কাতারে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন সামিট ফর এডুকেশন-২০২৩ সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল 'জীবনের জন্য উদ্ভাবনী শিক্ষা' নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কীভাবে সংবেদনশীল, দায়িত্ববান, সহযোগিতামূলক, কর্মোদ্যোগী, ডিজিটাল ও অংশীদারি হিসেবে রূপান্ড়র করা যায়, সেই উপায়টি খুঁজে বের করাই ছিল এ সামিটের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে ইউনেসকো-প্রণীত ফোর পিলার্স অব লার্নিং ধারণাটি বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর তা হলো লার্নিং টু নো, জানার জন্য শিখন এই শিখনে পেশাগত ও সামাজিক জীবনে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও জীবনদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, যা বাস্তবিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে। লার্নিং টু ডু করার জন্য শিখন, এই শিখন হবে প্রয়োগমুখী। শিক্ষার্থীর শিখন প্রয়োগের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় দক্ষতায়। এই দক্ষতা শুধু কর্মক্ষেত্রের জন্য নয়; হতে হবে ব্যক্তিক উদ্যোগ ও গুণাবলির উন্নয়ন, মনেবৃত্তির ইতিবাচক পরিবর্তন, মানানসই সামাজিক আচরণ ও ঝুঁকি গ্রহণ করার মানসিকতার ক্ষেত্রেও। লার্নিং টু বি পরিপূর্ণ হওয়ার শিখন, এই শিখনের উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখা; যেখানে ব্যক্তির অধিকার আদায় ও দায়িত্ববোধ পালনের মূল বিষয়; যথা শরীর ও মন, মেধা, সৌন্দর্য, সংবেদনশীলতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কল্পনাশক্তি, আধ্যাত্মিকতা, আত্মনির্ভরশীলতা, স্বাধীনতা, বিচার, সৃজনশীলতা, সংকটপূর্ণ চিন্তা, ও মানুষের স্বাধীনতাসহ শিক্ষার্থীর

সর্বোচ্চ সম্ভাবনার বিকাশের মাধ্যমে তাদের সামষ্টিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। লার্নিং টু লিভ টুগেদার একত্রে বসবাসের শিখন এই শিখন হবে সামাজিক মূল্যবোধমুখী যা উৎসারিত হবে শিক্ষার্থীর হৃদয় থেকে। এর উদ্দেশ্য হবে সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য দূর, মানবাধিকার সুরক্ষা ও গণতন্ত্রায়ন, মানসম্পন্ন টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশের সুরক্ষায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

শিক্ষার একটি টেকসই ভিত্তি গড়ার জন্য এই ফোর পিলার্স অব লার্নিং ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার চমৎকার একটি সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কেই সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে লাইফ লং লার্নিং বা সারা জীবন শিখননীতিতে অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়া উক্ত সম্মেলনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য একবিংশ শতকের শিক্ষার আরো পাঁচটি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। তা হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা, প্রযুক্তিনিভর যোগাযোগ, ৩. আন্তর্জাতিক ভাষা জ্ঞানে পারদর্শিতা, সামাজিক নেটওয়ার্ক ও সৃজনশীলতা ও ইনোভেশন।

শিক্ষা প্রদান বা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের ভিশন ও মিশন ও সঠিকভাবে স্থির করতে না পারলে আমরা আমাদের পথ হারাব। সদা পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে। মানবসভ্যতার বিবর্তনের মূলে রয়েছে শিক্ষা আর এই শিক্ষাকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফসল ঘরে তুলে আনাই হচ্ছে বর্তমানে শিক্ষা ও শিক্ষকতা পেশায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে সময়োপযোগী শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ, শিক্ষকের পেশাদারিত্ব মনোভাব, দায়িত্বশীলতা, বিষয়ভিত্তিক চর্চা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। তবে শিক্ষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা সমুন্নত না হলে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মাটি থেকে মহাকাশ জয়: বাংলাদেশে স্যাটেলাইটের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিটিআরসির হিসাবে প্রতিটি টিভি চ্যানেল স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ প্রতি বছর প্রায় দুই লাখ ডলার দিয়ে থাকে। যেসব বেসরকারি টিভি চ্যানেল এখন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট চ্যানেল ব্যবহার করছে, তারা এখন এই বিপুলসংখ্যক বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারছে। তবে এর সেবা বাংলাদেশের নিকটবর্তী অব্যবহৃত অংশ নেপাল ও ভুটানের মতো দেশে ভাড়া দিতে পারলে প্রতি বছর প্রায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা যাবে। কারণ, ৪০টি ট্রান্সপন্ডারের মধ্যে মাত্র ২০টি ব্যবহার করছে বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন সময়ে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়ে বিপুলসংখ্যক জনসম্পদ ও জানমালের ক্ষতির বিষয়টি ছিল উদ্বেগজনক। উন্নত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস পেতে দেরি হতো এই অঞ্চলটিতে। এই সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং প্রযুক্তির সহায়তা নিয়েছে।

কিন্তু আন্তদেশীয় ও মহাকাশীয় সংযোগের উন্নত ব্যবস্থা না থাকায় এসব দুর্যোগে ভালো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন বিশ্বে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের যুগ চলছিল। বঙ্গবন্ধু দেখলেন তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা ও সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইউরোপ এবং এশিয়ার অনেক দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। পাশাপাশি ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কার এ বিপ্লবের গতি, প্রভাব ও ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি কওে দেয়।

জাপান, চীন, কোরিয়াসহ এশিয়ার কিছু কিছু দেশ তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের আবির্ভাব থেকে সৃষ্ট সুযোগ কাজে লাগাতে শুরু করে। দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ 'ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ)' সদস্য লাভ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইট আর্থ-স্টেশন স্থাপন করেন। ফলে, বাংলাদেশ সহজেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম এবং আবহাওয়াসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়ার পথ সুগম হয়।

মহাকাশে স্যাটেলাইট প্রেরণে ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম এখন বিশ্ববাসীর জানা। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থিও যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ, যা ২০১৮ সালের ১১ মে (বাংলাদেশ সময় ১২ মে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ফ্যালকন ৯ ব্লক ৫ রকেটের প্রথম পণ্য উৎক্ষেপণে যান। বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহটি সম্পূর্ণ চালু হওয়ার পর বাংলাদেশের ভূ-কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

এজন্য গাজীপুরের জয়দেবপুর ও রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ায় ভূকেন্দ্র তৈরি করা হয়। জয়দেবপুরের ভূকেন্দ্রটি হলো মূল স্টেশন। বেতবুনিয়ায় স্টেশনটি দ্বিতীয় মাধ্যম ব্যাকআপ হিসেবে রাখা হয়। এ ছাড়া আরো বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে দুটি ভূ-উপগ্রহ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশের বিভিন্ন মিডিয়া সংস্থা বঙ্গবন্ধু-১ উপগ্রহ থেকে ভাড়া নেওয়া ট্রান্সপন্ডার ব্যবহার করছে।

যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- হন্ডুরাসের দুটি, তুরস্কের ১টি, ফিলিপাইনের ১টি, ঘানার ২টি, ক্যামেরনের ১টি, দক্ষিণ আফ্রিকার ২টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল। বাংলাদেশে এ মুহূর্তে টিভি চ্যানেল আছে প্রায় ৫০টি। ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা আইএসপি আছে কয়েক শ।রেরি স্টেশন আছে ১৫টির বেশি। আরো আসছে। ভি-স্যাট সার্ভিস তো আছেই। এর ব্যান্ডউইথ ও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ইন্টারনেটবঞ্চিত অঞ্চল যেমন- পার্বত্য ও হাওর এলাকায় উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে। তখন এর মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় যোগাযোগব্যবস্থা চালু রাখা হয়। এমনি আরো অনেক কারণেই বাংলাদেশে স্যাটেলাইটের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিটিআরসির হিসাবে প্রতিটি টিভি চ্যানেল স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ ডলার দিয়ে থাকে। যেসব বেসরকারি টিভি চ্যানেল এখন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট চ্যানেল ব্যবহার করছে, তারা এখন এই বিপুলসংখ্যক বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারছে। তবে এর সেবা বাংলাদেশের নিকটবর্তী অব্যবহৃত অংশ নেপাল ও ভুটানের মতো দেশে ভাড়া দিতে পারলে প্রতি বছর প্রায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা যাবে। কারণ, ৪০টি ট্রান্সপন্ডারের মধ্যে মাত্র ২০টি ব্যবহার করছে বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের সফল কার্যক্রমের পর বঙ্গবন্ধু-২ স্যাটেলাইট সম্প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কার্যক্রমও এগিয়েছে অনেক

দূর। অভিযানের সময়কাল ধরা হয়েছে ১৮ বছরের মতো। বঙ্গবন্ধু-২ স্যাটেলাইটটি হবে একটি পৃথিবী অবজারভেটরি স্যাটেলাইট। এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে ৩০০ থেকে ৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করবে। ফলে, দ্বিতীয় স্যাটেলাইটের জন্য অরবিটাল স্পট প্রয়োজন হবে না। এটি হাইব্রিড হতে পারে স্যাটেলাইট। স্যাটেলাইটটি আবহাওয়া, নজরদারি বা নিরাপত্তা-সংক্রান্ড় কাজে ব্যবহৃত হবে। তবে এখনো যেহেতু ধরনটি ঠিক হয়নি, তাই এই স্যাটেলাইটে কত খরচ হবে, এটি এখনো অজানা।

বাংলাদেশসহ ২৪টি দেশ নিজস্ব স্যাটেলাইট পাঠানোর চেষ্টা করছে। ভারত 'আর্যভট্ট' নামের প্রথম উৎক্ষেপণ পাঠায় ১৯৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল এবং পাকিস্তান 'বদর' নামের প্রথম উৎক্ষেপণ পাঠায় ১৯৯০ সালের ১৬ জুলাই। এমনকি ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, নাইজিরিয়া, ফিলিপাইন, কলম্বিয়া, মউরিতানিয়া, কাজাগাস্তানেও নিজস্ব উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট আছে।

১৯৫৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) স্পুৎনিক-১ নামে বিশ্বের প্রথম স্যাটেলাইট পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠায়। এরপর থেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার স্যাটেলাইট পাঠানো হয়েছে। ১৯৫৭ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ১১ হাজার স্যাটেলাইট পৃথিবীর কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করছে (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম)। এই সংখ্যা সম্প্রতি জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। বিশেষ কওে স্পেসেক্স মতো প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবে মহাকাশ নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কের স্টারলিংক প্রজেক্টের মাধ্যমে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে মহাকাশে ৪২ হাজার স্যাটেলাইট পাঠানো হবে বলে জানা যায়।

ছয় দশকের বেশি সময় ধরে মানব জীবনে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা রেখে চলেছে স্যাটেলাইট। তবে এর প্রত্যক্ষ সুবিধা ভোগ হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থায়। সমস্ত পৃথিবীকে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত করেছে স্যাটেলাইট। গত শতকের টেলিভিশন চ্যানেল, ইন্টারনেট ব্যবস্থা আবিষ্কার ও জনপ্রিয়তার পেছনে এর ভূমিকা অনেক। সম্পূর্ণ স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল জিপিএস এখন মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। সামরিক ক্ষেত্রেও এর রয়েছে ব্যাপক ব্যবহার।

উন্নত দেশগুলো তাদের সামরিক বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি, শত্রুরাষ্ট্র, সন্ত্রাসী বাহিনী, উগ্রপন্থি, পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণকেন্দ্রসহ সামরিক নানা কাজে স্যাটেলাইট ব্যবহার করছে। ওজন স্তরসহ বায়ুমণ্ডলের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের গবেষণার মূল উৎস হচ্ছে স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া তথ্য। পৃথিবীর যাবতীয় উপাদানসহ সৌরজগৎ ও মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণার জন্য মুখ্য ভূমিকা রাখছে এই প্রযুক্তি। এনবিসি নিউজের একটি প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, স্যাটেলাইট প্রযুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ।

এই প্রযুক্তির ফলে আগে থেকেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা সম্ভব হচ্ছে। ফলে, গত ৬ দশকে অন্তত হাজার হাজার মানুষের জীবন বেঁচে গেছে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। একসময় মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় ঝড়ের কবলে পড়ত। ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হতো। আজ আর তেমনটি নেই। স্যাটেলাইটের ফলে এখন আগে থেকেই দুর্যোগের বিষয় জানতে পেরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে মানুষ।

ব্রিটিশদের দ্বারা দু'শ বছর শাসনের পরও ২৪ বছর পরাধীন ছিল বাংলাদেশ। সব অর্জন ও সফলতা লুট করে নিয়ে যেত পাকিস্তানিরা। এ অবস্থা উত্তরণের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। বাঙালি ফিরে পায় তার প্রাণ, পতাকা ও দেশ। শুরু হয় বাঙালির ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। বঙ্গবন্ধুর দর্শন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা ধারণ করে বাঙালি এগিয়ে যায় সামনের দিকে। অর্জিত হয় অনেক সাফল্য, কিন্তু আবার হোঁচট খায়। তবু এগিয়ে যায় বীর বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের কাছে পরাধীন হয় ষড়যন্ত্রকারীরা। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা এবং সাহসিকতায় দেশ আজ

অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিশ্বের মডেল। এ পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতেও দেশ পিছিয়ে থাকতে পারে না। পারে না মহাকাশ বিজয়েও। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, পৃথিবী ও মহাকাশের মধ্যে যোগাযোগ এবং মহাবিশ্বের অনেক অজানা রহস্য উদ্ঘাটনে স্যাটেলাইটের ভূমিকা যে অপরিসীম, তা তিনি অনুধাবন করতে পারেন। এই ভাবনা থেকেই বাংলাদেশে একটি নিজস্ব স্যাটেলাইট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। উৎক্ষেপণ করেছে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট। অপেক্ষায় আছে বঙ্গবন্ধু-২ উৎক্ষেপণের। নিঃসন্দেহে প্রযুক্তি ও উন্নয়নে বাঙালি জাতির এই সাহস ও সক্ষমতার পেছনে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা। যার পেছনে শক্তি জুগিয়েছিলেন বাঙালি জাতির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বিশ্ব-অর্থনীতির পরিমণ্ডলে, সংগ্রামী একটি জাতি থেকে এক উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিতে বাংলাদেশের যে রূপান্তর ঘটেছে, ঘটনাটি ম্যাজিকের থেকে কোনও অংশে কম নয়। বিশ্ববাজারের এক উল্লেখযোগ্য নাম হয়ে ওঠার পথে দেশটির যাত্রা তার সাহস এবং সংকল্পেরই প্রমাণ দেয়। এখন যে সময়ে আমরা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রায়, পথের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা শিখতে হবে আমাদের। এই ভিশন বাস্তবায়নের মর্মে যে শিল্প খাতটি অবস্থান করে, সেটি হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত বা আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি; যা বাংলাদেশের সমৃদ্ধিতে প্রধান একটি পরিচালিকা শক্তি হিসেবে ইতোমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। ১.৮ বিলিয়ন ডলারের রফতানি বাজারসহ আইটি সেক্টরে ৩.৪ বিলিয়ন ডলারের একটি বাজার বিদ্যমান। প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা মূল্যমানের বার্ষিক বেতন দিয়ে, প্রায় তিন লক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছে বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টর। আমাদের অর্থনীতির একটি জরুরি ভিত্তি হয়ে উঠেছে শিল্প খাতটি। আমাদের জাতীয় জিডিপিতে এর প্রত্যক্ষ অবদান প্রায় ১.২৫ শতাংশ, পরোক্ষভাবে যা প্রায় ১৩ শতাংশ। এ পরিসংখ্যানগুলো জানা যায় সরকারি প্রতিবেদন অনুসারে। রফতানি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কৌশলগত একটি খাত হিসেবে আইসিটি শিল্পের গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। উচ্চ সিএজিআর-সহ ক্রমবর্ধমান একটি খাত আইসিটি প্রতিবছর বিশ হাজারেরও বেশি লোক নিয়োগ করে চলেছে।

আইসিটি শিল্পের সাফল্য উদযাপনের পাশাপাশি আমাদের মনে রাখতে হবে, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো সফলতার সঙ্গে উতরে যেতে সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। ২০২৪ সালের জুন থেকে আইটি এবং আইটি-এনাবেলড সার্ভিসের জন্য ছাড়কৃত করপোরেট করের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। এই প্রণোদনা বাদে ছোট এবং মাঝারি আকারের আইসিটি কোম্পানিগুলো, যেগুলো কিনা এই শিল্প খাতের মেরুদণ্ড তৈরি করে, তাদের ব্যবসা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। হাজার হাজার

আইসিটিনির্ভর পেশাজীবীর জীবিকা ঝুঁকির মুখে পড়বে, একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার দিকে আমাদের অগ্রযাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হবে।

আইসিটি শিল্প, ছাড়কৃত করের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে তা বাংলাদেশি শিল্প খাতের ইকোসিস্টেমে একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শিল্পটি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে, ফলে কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে। এমনকি আইসিটি পেশাজীবীদেও বেতন থেকে প্রাপ্য আয়করের অংশটিও কমে যাবে। সার্বিকভাবে, অর্থনীতির স্বাস্থ্যকে আইসিটির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলতে পারি, বৈশ্বিক আইটির একটি প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠার পথে বাংলাদেশের যাত্রায় তা বিঘ্ন ঘটাবে।

স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকল্প তৈরি হয়েছে এআই, আইওটি, ব্লকচেইন, রোবটিকস, মেশিন লার্নিংয়ের মতো প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এগুলো, এসব প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার হয়। নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে যদি প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের সেই উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি না হয়, ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের ভিশন কখনোই অর্জিত হবে না।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) পর্যায় থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের পরবর্তী সময়ের জন্য রফতানি প্রণোদনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো প্রস্তাবিত হয়েছে, তা আমাদের আইসিটি রফতানির বৃদ্ধিকে আরও বাধাগ্রস্ত করতে পারে। উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে প্রত্যাশিত রফতানির ওপর নামমাত্র ২ শতাংশ প্রণোদনা দিলে আইটি রফতানির ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বৈশ্বিক ক্যানভাসে আইসিটি পরিষেবার একটি গন্তব্য হয়ে ওঠা কেবল স্বপ্ন থেকে যাবে আমাদের।

এই চ্যালেঞ্জগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক পরিষদ এবং জাতীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের একটি সাহসী এবং কৌশলগত অবস্থান নেওয়া দরকার। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনার চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে আইসিটি শিল্প যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এই শিল্পক্ষেত্রের অগ্রযাত্রা বজায় রাখতে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের। ২০২৪-এর পরেও আইসিটি সেক্টরের জন্য কর প্রণোদনা যেন চলতে থাকে, রফতানি প্রণোদনার নীতিগুলো যেন বৃহত্তর সুবিধার কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে, এবং এই শিল্প খাতে যত উদ্যোগ ও এসএমই গড়ে উঠেছে, সেগুলো বেড়ে ওঠার জন্য যেন একটি অনুকূল পরিবেশ পায়।

বাংলাদেশ আজ এক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির পথে আছে, এবং আইসিটি শিল্প নিঃসন্দেহে এর ভবিষ্যৎ তৈরিতে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করবে। তবে এই রূপকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং এই সেক্টরে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার স্বার্থে, একটি সাহসী ও কৌশলী উপায় অবলম্বন করতে হবে আমাদের। বাংলাদেশের আইসিটি শিল্পকে পূর্ণ সম্ভাবনায় উন্মোচিত করার এখনই সময়। আশা করি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চালিয়ে যাবো আমরা, উৎসাহিত করবো উদ্ভাবনাকে এবং সব বাংলাদেশির জন্য এক উজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধতর ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করে যেতে হবে।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও রিসার্চ ফেলো
ফিডব্যাক: *hiren.bnnrc@gmail.com*
ছবি: ইন্টারনেট